বিষয় : কোভিড পরিস্থিতি এবং প্রকাশনা শিল্প

"আমার প্রফিট এখানেই যে আমি বেঁচে আছি"

কথাবার্তায় গাঙচিলের কর্ণধার অধীর বিশ্বাস ও মধুরিমা দত্ত

বই। আমরা কেউ বই পড়ি, কেউ বই শুনি, কেউ বই দেখি। মূল কথা আমরা সবাই বই সঙ্গ করি। বইয়ের পাতার গন্ধ, পড়তে থাকা পাতার মাথায় ভাঁজ করে রাখা এইসব কিছু নিয়েই আমাদের বই যাপন। ওই বইয়ের পাতার ভাঁজটাই আমাদের পেজ মার্কার। বই না পিডিএফ এই তর্ক বেশ কিছু বছর আমাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেও আমরা অনেকেই তাকে সামান্য গুরুত্বও দিই নি। বই তো বই, তার বিকল্প আবার কী! কিন্তু হঠাৎই সময় তুমুল পালটে গেল। শুধু স্কুল, কলেজ না; লাইব্রেরিতেও এখন তালা। বইমেলার প্রস্তুতি এখন শুরু হয়ে যাবার কথা। ওটাই তো বই ক্রেতা বিক্রেতার অক্সিজেন। তার আগে ঘুরে দাঁড়াতে হবেই, কিন্তু কীভাবে.. কী ভাবছেন প্রকাশকরা, কেমন আছেন প্রকাশনার সাথে যুক্ত অজস্র মানুষজন? কতটা ক্ষতির কারণ আমফান আর কতটাই বা অন্য কারণ? টকটার্ন কথাগ্রামের সপ্তম পর্বে ছিলেন গাঙচিল প্রকাশনার কর্ণধার মাননীয় অধীর বিশ্বাস।

মধুরিমা : প্রথম যে প্রশ্নটা আমরা এখন সবাইকেই দেখা হলেই করছি, কেমন আছেন? কাজ কেমন চলছে? যাচ্ছেন কর্মক্ষেত্রে নাকি বাড়ি থেকেই কাজ চলছে?

অধীর : শরীরে ভালো আছি। নানা রকম বায়না বাড়ছে, কাগজপত্র গোছাচ্ছি। সারাজীবনের বকেয়া কাগজ। এই যে করোনা শুরু হয়েছে তাতে কেবল আতঙ্ক, দুশ্চিন্তারই খবর। কিন্তু তাতে তো জীবন, প্রাত্যহিক দিন চলবে না। সবারই ঘর সংসার, দায়িত্ব রয়েছে। এটা বরং একটা অবসর বলা যায়। এই অতিমারীর ছুটিটা এক প্রকার নতুন জন্ম দিল যেন আমাদের। শৈশবে যেমন করে একটা শিশু বড় হয়, আস্তে আস্তে দাঁড়াতে শেখে, আমরাও সেরম ভাবে আস্তে আস্তে এই জীবন ধরনটায় বাঁচতে শিখছি। অনেককাল আগে আমাদের গ্রামেও কলেরা হয়েছিল। নিজের চোখে এরকম একটা মহামারী দেখা, তখন থাকতাম ওপার বাংলায়, ষাটের দশকে। সে এক আতঙ্কের ব্যাপার, মৃতদেহের স্তূপ চারিদিকে। শুদ্ধ জল খেতে হবে, ফোটানো জল খেতে হবে, এসব কিছুই জানি না। কুয়োর জল খেতাম তখন। অন্ত্যজ মানুষ বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কুয়োতে

আমাদের হাত দিতে দিত না। গামলা, হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ওরা তুলে দিত, আমি ভরতাম। এই জীবন সংগ্রাম কাটিয়ে আসার পর যখন একটা তুলনামূলক স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অবস্থিতি হয়েছে, তখনই আবার একটা ভাইরাস, একটা অজানা বিষয় অতিমারী রূপে এসে দাঁড়াল জীবনে। তখনকার দিনে অন্তত এরম নিষেধাজ্ঞা দেখিনি, ছিল না কোনও মহামারীতে। এখন সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে বাইরে বেরোনোয়। লকডাউন হয়েছে, কার্ফিউ জারি হচ্ছে। আমার তো সেই অর্থে লেখাপড়া নেই। বিনয় করে বলছি না, সত্যিই বলছি। কোনও রকম মুখস্থ করে পাশ করা। কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন জ্ঞানী মানুষের সান্নিধ্যে যে দীক্ষাটা পেয়েছি, যে গন্ধ বর্ণ উপলব্ধি করেছি, যেভাবে দেখতে শিখেছি, সেখান থেকে একটা বোধ অর্জন হয়েছে। একজন সাধারণ কৃষকের মতো, যার পুঁথিগত শিক্ষা নেই। জীবন আর প্রকৃতির থেকে যেভাবে সে শেখে, সেরকম অনেকটা। সেই বোধ থেকে আমার মনে হয়েছে, এই লকডাউন আমায় একটা নতুন জীবন দিয়েছে। এর মধ্যে নতুন ভাবনা, আমার নথিভুক্তিকরণের কাজ বেড়ে গেছে। আগে দোকান যেতাম, সব সামলে এসে রাতে বাড়ি ঢুকে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। দিনের শেষে কোনও কাজ হত না আর। এখন সেই নিজের কাজগুলো করতে পারছি। এটা ঠিক যে, ব্যাবসা, আর্থিক জায়গা থেকে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন মানুষ প্রয়োজনে পাশেও দাঁড়াচ্ছেন...

মধুরিমা : আমাদের পরের প্রশ্নটা এই সূত্র ধরেই বলে একটু আগে থামাচ্ছি। আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, লকডাউনের কারণে মানুষের জীবিকায় একটা বড় ক্ষতি তো হচ্ছেই। আমরা জানিই যে, লকডাউনে প্রকাশনার কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ মানুষ বই কিনতে দোকানে যেতে পারবেন না। সাথে আবার আরও একটা বিপদ হয়ে দেখা দিল আমফান ঝড়। কিছুদিন আগেই দেখলাম আমফানে আমাদের বইপাড়া কলেজ স্ট্রিটের বহু বইয়ের দোকান ভেসে গেছে। আপনার তো অনেকটা সময় ওই জায়গাতেই কেটেছে, ভবিষ্যতে কাটবেও। এই বিষয়ে একজন প্রকাশক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতাটা জানতে চাইছি।

অধীর : দেখো, আমফানে যে ক্ষতির কথা প্রচার করা হচ্ছে, আর আসল যে ক্ষতিটা হচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু কিছু পার্থক্য রয়েছে। আমার নিজের যা বিশ্লেষণ সেই অনুযায়ী বলতে পারি, আমফান তো হঠাৎ করে আসেনি

ভূমিকম্পের মতো। প্রায় সপ্তাহ খানেক ধরে আবহাওয়া দপ্তর তো প্রচার করেইছে যে একটা বিধ্বংসী ঝড় আসছে বাংলায়। যাদের নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব আছে, তাদের যথা সম্ভব রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে প্রশাসন। তাছাড়া, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ হলেও তাঁরা নিজেরাই অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, চলে গেছেনও অনেকে। এবার, বইপাড়ায় যারা এরকম ব্যাবসা করেন, যাঁদের শিক্ষিত সাংস্কৃতিক মহলের সঙ্গে নিত্য ওঠা বসা, তাঁরা তো ন্যূনতম চেতনার বাইরে নন। হতেই পারে তাঁদের অনেকের সেই অর্থে লেখাপড়া নেই, কিন্তু দুর্যোগের সংবাদ তো তাঁরা বারেবারে আগাম পাচ্ছেন। তারপরেও, সাতদিনের মধ্যে তাঁরা তাদের বইয়ের সম্ভার সরিয়ে নিতে পারেননি, এটা আমার কাছে অতটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যেটুকু নিরাপদ আশ্রয় নিজের জন্যে জোগাড় হয়েছে, বইপত্রও সেখানে সরিয়ে নেওয়াই গেছে বলে আমার বিশ্বাস। এরপরেও নিতান্তই যাঁরা সরিয়ে নিতে পারেননি, তাঁদের কাছে অত্যন্ত মুল্যবান কোনও বই ছিলনা বলেই ধারণা হয়। যা বই ভেসে গেছে, তার অধিকাংশই স্তূপাকার পুঁটুলি বাঁধা বইপত্র সমূহ। সুতরাং, বইপাড়ায় যতখানি ক্ষতির প্রচার হয়েছে, ক্ষতির আর্থিক মূল্য একেবারেই অতটা নয় বলেই আমার ধারণা। এবার বই ভিজে যাওয়ার মতো ক্ষতি প্রতি বর্ষাতেই হয়ে থাকে, হয়তো এবার তুলনামূলক ভাবে সামান্য একটু বেশি ভিজেছে। কিন্তু গেল গেল রব তোলার মতো ক্ষতি হয়নি একেবারেই। আমফান আলাদা করে ক্ষতির খাতা বাড়াতে পারেনি। ক্ষতি বাড়িয়েছে এই লকডাউন। প্রকাশনা, বই বিক্রি এসমস্তই লকডাউনে ভীষণভাবে ব্যহত হয়ে ক্ষতির বোঝা মারাত্মক বাড়িয়েছে। শুধু কলেজ স্ট্রিটের মানুষ নিয়ে তো আমাদের ব্যাবসা হয় না। যদি জেলা থেকে মানুষ না আসেন, বিক্রি হয় না আমাদের। আর ট্রেন, বাস ইত্যাদি যোগাযোগের সমস্ত মাধ্যম বন্ধ বলে কেউই আসতে পারছেন না। বিভিন্ন জেলায় বইমেলাগুলো থেকে যে বাড়তি অর্থ আসে তা পুঁজিতে লাগানোর পর মার্চ থেকে আবার আগামী বইমেলা পর্যন্ত অল্প অল্প করে লভ্যাংশ উঠে আসে। এই বছর সবে সেই কাজ শুরু হয়েছিল, তখনই এই লকডাউন, এবং তার মাঝে আমফান। সুতরাং, লকডাউনে বড়ো ক্ষতি হয়েছে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমফানের কারণে আলাদা করে কোনও বিশেষ ক্ষতি হয়েছে, এটা আমি বলতে পারি না।

মধুরিমা : কলেজ স্ট্রিটে আমরা দু'ধরনের বিক্রেতা পাই, এক, যাঁরা বড় প্রকাশনা, দুই, যাঁরা ফুটপাথে বই বিক্রি করেন। এখন, সেই অর্থে বড়ো প্রকাশনা নয়, কিন্তু ছোটো ছোটো দোকান যেখান থেকে ছাত্রছাত্রীরা বই সংগ্রহ করেন, তাদের ক্ষেত্রটা কীরকম? আমফান বা লকডাউনে বড়ো প্রকাশনার সঙ্গে তাঁদের অবস্থার কি কোনও বৈষম্য দেখা যাচ্ছে? ফুটপাথের দোকানের ক্ষতির হারটা কি বড়ো প্রকাশনার থেকে বেশি?

অধীর : বড়ো প্রকাশনা তো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর ছোটো হলেও নিদেন পক্ষে যাঁদের একটা প্রকাশনা রয়েছে, তাঁদের আর কিছু না হোক, একটা মাথা গোঁজার ঘর রয়েছে, নিজের ঘর হোক বা অন্যের। তবে আমি যেহেতু রোজ যাচ্ছি না তাই পুরোটা না দেখে পুরোপুরি বলতেও পারছি না। তবু আমার এটুকু ধারণা, প্রকাশনার যা ক্ষতি হয়েছে, তা সামাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষতি আমফানের কারণে নয়, আবারও বলছি। লকডাউনের কারণেই ক্ষতি, এবং সেটা এই পুরো শিল্পের ক্ষতি। আমফানে যদি ক্ষতি হয়ে থাকে, তা ফুটপাথের বিক্রেতাদের। কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, বড়ো প্রকাশনার মতো তাঁদের কিন্তু এস্টাব্লিশমেন্ট কস্ট নেই। আমার ক্ষেত্রে আমার প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত পরিবারগুলোকে, নিজে ডাল ভাত খেলে, তাদের শাকভাত খাওয়ার অর্থটা অন্তত পাঠিয়েছি। সেই অর্থ কিন্তু ব্যাবসার পুঁজি অথবা কোনও সঞ্চয় ভেঙে। সেই ক্ষতিটা কিন্তু একজন প্রকাশকের। এই ক্ষতিটা আবার ফুটপাথের দোকানে নেই।

মধুরিমা : এই প্রসঙ্গেই জানতে চাই আরও একটা কথা। বইয়ের ক্ষেত্রটা তো শুধু প্রকাশক, লেখক, আর পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মাঝে রয়েছেন যিনি বই বাঁধাই করেন, যিনি প্রুফ দেখেন, যিনি ডিটিপি করছেন, প্রচ্ছদ তৈরি করছেন ইত্যাদি....

অধীর : একদম। একটা পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে আসার পর যে প্রক্রিয়া, ডিটিপি করা, প্রচ্ছদ করা, প্রুফ দেখা, এরপর ছাপাখানায় গেলে ছাপাখানার কর্মীরা, এ এক বিরাট শিল্প। এরা বইপাড়ার নেপথ্য কর্মী...

মধুরিমা : একদম, এই বইপাড়ার নেপথ্য কর্মীদের নিয়ে পুরোটা একটা বড়ো ব্যাপার। এবং এখান থেকেই প্রশ্নটাও। এখন একটা সংকট আসছে, "বই না পিডিএফ?" এখন যে কোনও বই কিনতে গেলেই, কোনও কারণে যদি না পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আমরা পিডিএফের খোঁজ করি, বা এমনিও

আমরা বইটা না কিনে পিডিএফ নামিয়ে নিই। পিডিএফ ব্যাপারটা একটা বই পাইরেসির মতো ব্যাপার। এখন এই লকডাউন পরিস্থিতিতে বই কিনতে যাওয়ায় বাধা পড়ার ফলে পিডিএফের প্রবণতা তো মারাত্মক ভাবে বাড়ছে। এই পিডিএফ প্রবণতা মানুষের অভ্যাস হয়ে গেলে, প্রকাশনা এবং এই বইপাড়ার নেপথ্য কর্মীদের ভবিষ্যৎ কী? এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কী?

অধীর : পিডিএফ যদি নামিয়ে নেওয়া যায়, একটানা যদি অনেকক্ষণ তুমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকো, মন চাইবে চোখটাকে একটু স্বস্তি দিতে, মনে হবে একটু চা খেয়ে আসি বা এরকম কিছু। কেউ যদি পিডিএফ পড়ে পড়ার আনন্দ পান তাতে অসুবিধে নেই। কিন্তু আনন্দ না পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি কারণ এতে চোখ তথা সার্বিক শরীরেরই অস্বস্তি বাড়ে। বইয়ের যে নান্দনিক দিক রয়েছে, একটা প্রচ্ছদ, একটা সুন্দর কাগজ, তাতে একটা সুন্দর বুকমার্ক দিয়ে রাখা, এই যে একটা 'সঙ্গী'র মতো ব্যাপার, এটা কিন্তু পিডিএফে নেই। একটা বই তো শুধুমাত্র কিছু অক্ষর নয়, সামগ্রিকভাবে এটা একটা শিল্প। এবার যিনি এই শিল্পটিকে পেতে চান, পিডিএফ তার আশা কতটা পূরণ করতে পারবে জানি না। ই-বুক বা পিডিএফ ব্যাপারটায় কাজ চলে ঠিকই, কিন্তু বইয়ের বিকল্প পিডিএফ হয়ে উঠতে পারবে কিনা অদূর ভবিষ্যতে এই নিয়ে আগাম কোনও ধারণা আমি এখনই করতে পারছি না। তবে আমি বিশ্বাস করি, যাঁদের বই কেনার; এই দুর্যোগ, অব্যবস্থা কেটে গেলে তাঁরা আবারও কিনবেনই। এই শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। অন্তত আমার 'গাঙচিল'-এর পাঠকদের আমি সিরিয়াস পাঠক হিসেবেই জানি। এঁরা কখনওই ডিজিটাল বই অভিমুখী হবেন না নিশ্চয়ই।

মধুরিমা : কিন্তু বহু সহজলভ্য বই থেকে শুরু করে বহু দুষ্প্রাপ্য বই এখন পিডিএফে মিলছে। এই লকডাউনে অনেকেই নিজেদের ইনবক্সে একসাথে এরকম বহু বইয়ের লিংক পেয়েওছেন। কেউ কেউ সেটাকে আনন্দের আকর হিসেবেও নিয়েছেন। তাছাড়া, এখন জীবন এমন মোবাইল কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে যে, অনেকের কাছেই শুনি, "বই আর পড়া হয় না, ওই মোবাইলে একটু দেখে নিই"। আমার নিজের ব্যক্তিগত ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোনে কিছু পড়তে অসুবিধে হয়, এমন অনেকেরই হয়। কিন্তু আবার অনেকেরই

অসুবিধে হয়ও না। এবং সময় যত যাচ্ছে, এই "অসুবিধে না হওয়া" মানুষের সংখ্যা তো বাড়ছে।

অধীর : তাঁদের সাথে আমার বিরোধ নেই কোনও। আর আমার বই যদি নকল হয়, পিডিএফ হয়, জানব আমার বই প্রকাশনা সার্থক। কারণ আমার সেই বইটাই নকল হচ্ছে যেটা মানুষেরা চাইছেন। তার মানে, একটা ঠিকঠাক বই আমি প্রকাশ করতে পেরেছি। এটা আমার অর্জন। পাঠক পড়ুন না পিডিএফে, আমার আপত্তি নেই। শুধু পিডিএফে গাঙচিল লেখাটা যেন থাকে। বইটার প্রকাশনা গাঙচিলের এটুকু মানুষ যদি জানতে পারেন, আমি তাতেই খুশি। কেবল অন্য কোম্পানির লোগো না থাকলেই হবে। পরিস্থিতি যাই হোক, বই আমি তৈরি করবই। প্রকাশের হার কম হতে পারে, কিন্তু প্রকাশ হবে। সেটা পাঠকের এবং নিজের ভালো থাকার জন্য, ভালোবাসার জন্য। এবং আমি বিশ্বাস করি তাতে, পিডিএফের সঙ্গে এই পথ চলায় জয়ী হবে বইই। ভালো প্রকাশনা বেঁচে থাকবেই। নকল বই তো কলকাতাতেই বিস্তর পাওয়া যায়। আমার বইও নকল হয়, যদিও সেটা করা মুশকিল কারণ আমার বইয়ের বিষয়, ধরন, গড়ন সবার থেকে একটু আলাদা।

মধুরিমা : আপনি বলছিলেন যে এই ফেব্রুয়ারি নাগাদ শেষ হয় বইমেলার মরশুম। এবং আমরা জানিই যে এই সময় থেকে পূজাবার্ষিকীর কাজ তো শুরু হয়ে গেছেই। এদিকে মোটামুটি নভেম্বর থেকে শহরতলির বইমেলাগুলো শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যা মনে হচ্ছে তাতে নিদেনপক্ষে ডিসেম্বর অবধি এই অতিমারীর ব্যাটিং চলবেই। এতে বইমেলাগুলোর কী ভবিষ্যত হতে পারে বলে মনে হচ্ছে? এই অবস্থাটা কীভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে?

অধীর : দেখো, যা আন্দাজ পাচ্ছি তাতে এই বারে বইমেলা হওয়ার কথা নয়, হওয়া উচিতও নয়। এই সংক্রামক রোগের সময়ে একটা গ্যাদারিং ঠিক নয়। মানুষও ভীত হয়ে থাকবে এরকম মেলা হলে। কলকাতা বইমেলাও সম্ভবত হবে না। প্রশাসনও সম্ভবত অনুমতি দেবে না। আর ভবিষ্যতের কথা যদি বলি, এই বেসরকারি মেলাগুলো, যেমন তোমাদের আসানসোলে হয়ে থাকে, এইরকম বইমেলাই প্রকৃত বইমেলা হয়। সরকারি মেলাগুলো গোটাটাই গোলমাল আর কারচুপিতে ভর্তি। অসৎ উপায়ে বইমেলা চলে। লাইব্রেরির বই কেনারই যদি থাকে, তার জন্যে

লাইব্রেরির কাছে টাকা আসুক আলাদা করে। বিভাগীয় ভাবে আলাদা করে সেই বই কেনা হোক। কিন্তু বাম আমল থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্যে যে বইমেলা শুরু হয়েছে তা কখনই সার্থক বইমেলা হিসেবে রূপায়িত হয়নি। এই যে সরকারি বইমেলায় যাই, তাতে কুড়ি পঁচিশ হাজারের বেশি আমার বিক্রিই হয় না। একটা অনৈতিক এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি মাঝে একটু। দেখো, দুটো জিনিসের যোগ্যতা লাগে না। এক, পিতা মাতা হতে গেলে, দুই, প্রকাশনার প্রকাশক হতে গেলে। কিন্তু প্রকৃত প্রকাশক হতে গেলে তাঁর ন্যূনতম একটা জার্নির দরকার। একটা নিজের মতোন করে শিক্ষার দরকার। কিন্তু এই সরকারি বইমেলায় গিয়ে দেখি, তথ্য দিয়ে বলতে পারি, বেশিরভাগ মানুষই অপ্রকাশক। প্রকাশক নন। তুমি তাঁদের নাম জানো না, এরকম মানুষ। অথচ লাইব্রেরিয়ানরা তাঁদের থেকেই বই কিনছেন। কারণ বিলে পনেরো শতাংশ ছাড় হচ্ছে এক রকম, আবার পনেরো শতাংশ তাঁকে হাতেও দেওয়া হচ্ছে। আমি দিলে, ঐ হাতে পনেরো শতাংশ তো দেব না। সুতরাং আমার কাছ থেকে দশ কী পনেরো বই নেন তাঁরা। গড়ে প্রত্যেকে একটা করে। দুই হাজার, দেড় হাজার টাকার বিক্রিও হয় না। ওদিকে, কলেজস্ট্রিটে যেমন বই পাওয়া যায়, সেরকম বই পঞ্চাশ শতাংশ, ষাট শতাংশ ছাড়ে তাঁরা নিচ্ছেন। সেগুলোই লাইব্রেরিতে যাচ্ছে। তুমি সরকারি লাইব্রেরিগুলো ঘুরে এলেই বুঝতে পারবে কী বই কেনা হয়েছে। এই যে জঞ্জাল কেনা, সরকারি টাকা খরচ করে মানুষকে শিক্ষিত করার বদলে অসাধু কর্মীরা এই যে বই ভরাচ্ছেন, সেই মেলা কেন থাকবে? থাকার কি কোনও দরকার আছে? বেসরকারি বইমেলাগুলোয় আয়োজকরা বাছাই করেই প্রকাশনাদের ডাক দেন আসার জন্যে। আর আমি দেখি, সেখানে আমার বই বিক্রি হয়। সেখানেই পাঠক থাকে। কাজেই, ভবিষ্যতের বইমেলা বা বইমেলার ভবিষ্যত নিয়ে আমি বিশেষ আগ্রহী নই। তিন চারটে বইমেলা ছাড়া নিজে যাইও না। এই অনাচারের জন্যেই যাই না।

মধুরিমা : আপনার প্রসঙ্গ ধরেই বলি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি, একাধিক বইমেলা হতে, যার মধ্যে একটা থাকে সরকারি মেলা, বাকিগুলো সরকারি নয়। সরকারি মেলাগুলোয়, মেলা আয়োজনের খরচের জন্যে তেমন চিন্তা থাকে না কারণ সরকারি বরাদ্দ টাকা ঠিক পৌঁছে যায়। কিন্তু

যেই মেলাগুলো কোনও ক্লাব বা ছোটো কোনও সংস্থা আয়োজন করে, আমরা প্রায়ই শুনতে পাই, এই সংস্থাগুলো ধুঁকছে। বইমেলায় আর আগের মতো লোকও আসে না। তাছাড়া বড়ো একটা সমস্যা হল, আর্থিক সমস্যা। এই যে এত এত প্রকাশনা এনে, দশদিন ধরে একটা মাঠ ভাড়া নিয়ে, এত খরচ করে সাজিয়ে গুছিয়ে এত বিপুল একটা আয়োজন, এর তো খরচও বিপুল। অনেক সময়ই উদ্যক্তারা ভয় পান যে এবার বইমেলাটা হয়তো কোনও রকমে নমঃ নমঃ করেই সারতে হবে। সরকারি বইমেলায় এই সমস্যাটা থাকছে না। কিন্তু আপনি যা বলছেন, সরকারি বইমেলাতেই এই অনাচারের কথা, এটা তো সত্যিই আশঙ্কাজনক। সামগ্রিক বইমেলার ভবিষ্যতের জন্যেই আশঙ্কাজনক।

অধীর : তুমি লাইব্রেরি গিয়ে সমীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে পরিস্থিতিটা। দেখবে হয়তো একই প্রকাশনার বই দশখানা ঢুকে গেছে এদিকে সত্যিকারের ঠিকঠাক একটা বই হয়ত একখানা ঢুকেছে। ব্যক্তিগত পছন্দ দিয়েই বলো না, তুমি কোনটা চাও? হরির লুটের মতো একগাদা বই, পছন্দ অপছন্দ ব্যাতিরেকে? নাকি নিয়ন্ত্রিত চাও, মানুষের টাকা নষ্ট না করে, প্রয়োজনীয় বই চাও? বরং বিকল্প হিসেবে এটা হওয়া দরকার যে, সরকার ঐ অঞ্চলের কোনও একটা বা একাধিক সংগঠনকে দায়িত্ব দিক, কিছু অনুদান দিক। একটা সরকারি বইমেলায় যা খরচ হয় তার সামান্য অংশ অনুদান দিক, আর বাকি অংশটা সেই সংগঠন অন্যভাবে জোগাড় করে বইমেলাটা করুক। সরকার পুরোপুরি দেখবে না মেলাটা। দেখা উচিতও না। মানুষের টাকা এভাবে নষ্ট করা উচিত না। যদি সদর্থক কাজে হত, সত্যিই মানুষের কাজে লাগত, আমার আপত্তি থাকত না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা হয় না।

মধুরিমা : একটা শেষ প্রশ্ন। এই প্রেক্ষিত ধরেই জিজ্ঞাসা। এই বইমেলাগুলো বা গ্রন্থাগারগুলো বা কোনও ব্যক্তি মানুষ বা কোনও সংস্থা যদি এই পরিস্থিতিতে, এই অতিমারী বা এইরকম আগামী কোনও প্রকার কঠিন পরিস্থিতিতেই, মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার জন্যে কোনও রকম সাহায্য করতে চায় প্রকাশকদের, সেই সাহায্যের মাধ্যম কী কী হতে পারে?

অধীর : প্রথমত সেই সংস্থার মধ্যে একজন প্রকৃত পাঠক মানুষ দরকার। এবং এরকম মানুষদের নিয়ে যদি একটা কমিটি করা হয়, সেই কমিটি বাজারের বিভিন্ন বইয়ের ক্যাটালগ দেখে তাঁদের যা সম্যক ধারণা, তার ওপর ভিত্তি

করে, কোনও পক্ষপাত না রেখে প্রকাশকদের থেকে বই গুলো সংগ্রহ করুন। এই পছন্দ পক্ষপাতহীন ভাবে চাই, তাতে যদি আমার নিজের মাত্র দু'টো বই বিক্রি হয় আমার তাতেও অসুবিধে নেই। ঐ দু'টো বিক্রিই আমার লাভ। এবং এই ভাবে বই সংগ্রহ করে যদি মানুষের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ কেউ নেন সেটা আমার ভীষণ ভালো লাগবে, আমি অত্যন্ত স্বাগত জানাব। প্রকাশনা শিল্পকে বাঁচানোর জন্যে এটা খুব ভালো একটা ভাবনা। কিন্তু আবারও বলছি, পক্ষপাত হলেই মুশকিল। সাহায্যটা প্রকৃত শিল্প পাক। শুধু তো প্রকাশকই নয়, প্রকাশনার নেপথ্যের কারিগররাও রয়েছেন সেই শিল্পে। এই নেপথ্যের মানুষেরা খুব কম পয়সায় জীবন কাটান। হপ্তা মাইনে যা পান তাঁরা তাতে খুবই কষ্টে দিন চালাতে হয় তাঁদের। এদিকে সাহায্য যা আসে, তাতে এঁদের কথা কারও মনে থাকে না। এটা আমি চাই না। ওদের বাদ রেখে আমি কেন, গোটা শিল্পই বাঁচবে না। যদি কেউ সাহায্য করতে চান, সেই সাহায্যের পঁচাত্তর ভাগ কিন্তু এই নেপথ্য কর্মচারীদের জন্যেই ভাবতে হবে। কারণ প্রুফ রিডার, বই বাঁধাই কারিগর থেকে মুটে, এরা সবাই কিন্তু আমার সহকর্মী।

মধুরিমা : অনেক ধন্যবাদ। অনেক কথা আজ হল কিন্তু আরও বেশি কথা বাকি রয়ে গেল। সেই কথা আগামী কোনও সাক্ষাৎকারে, অথবা সামনাসামনি বসে হবে।

অধীর : 'আমার প্রফিট এখানেই যে, আমি বেঁচে আছি'। বেঁচে আছি, কথা বলছি। আমার এই বেঁচে থাকাটা আমার একটা বোনাস। এই মরশুমে এটাই আমার প্রফিট। একজন প্রকাশক তথা বইপ্রেমী হিসেবে বলব, ই-বুক পড়ুন, পিডিএফ নামান, যেভাবেই থাকুন, ভালো থাকুন। বই, নাটক, গান, সিনেমা, শিল্প বিনোদনে থাকুন। বাড়ির কাজ করুন, বাড়িতে কাজ করুন, ব্যস্ত থাকুন। গোটা সমাজ, গোটা দেশ অভাবে থাকুন, কিন্তু সুস্থ থাকুন।

কে বলতে পারে, আমার বয়সের কারণে অথবা এই অতিমারীর কারণে দেখা নাও হতে পারে সামনে থেকে। কিন্তু এই সম্পর্কটা তো রয়ে যাবে। মানুষ তো বেঁচে থাকে তার কাজ, তার ব্যবহার, তার স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। ওটুকু তো রইবেই।

মধুরিমা : আমিরা তবু পজিটিভই থাকব। দেখা নিশ্চয়ই হবে।